(খ) ভারতবর্ষ : মোগল আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতে কোনো রাজনৈতিক সংহতি ছিল না। দিল্লির সুলতানি সাম্রাজ্য এক ক্ষুদ্র আঞ্চলিক গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাব, দোয়াব অঞ্চল, ত্রিহূত ও বুন্দেলখণ্ডের কিয়দংশের বাইরে সুলতানির কার্যত কোনো অস্তিত্ব ছিল না। দিল্লি সুলতানি ছিল কিছু করদ রাজ্য ও জাগীরের সমষ্টি মাত্র। ক্ষমতালিপ্সু আফগান আমির-ওমরাহগণ সুলতানকে অমান্য করত ও তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকত। আফগানগণ বিভাজিত সার্বভৌমত্বের তত্ত্বে বিশ্বাসী হওয়ায় তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য ও গোষ্ঠী চেতনা ছিল প্রবল। ইব্রাহিম লোদী এই প্রবণতা রোধ করে সুলতানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে আমির-ওমরাহদের বিরাগভাজন হন। তারা সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়, অনেকে বিদ্রোহ করে। ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খান লোদী অভিজাতবর্গের একাংশের সমর্থনে সিংহাসন দাবি করেন। পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খান লোদী স্বাধীন হয়ে যান। আলম খান ও দৌলত খান লোদীর সুলতান বিরোধিতা এমন পর্যায়ে যায় যে তাঁরা কাবুলের অধিপতি মোগল নেতা বাবরকে ভারত আক্রমণের আমন্ত্রণ জানান।

দিল্লি সুলতানির বাইরে পশ্চিম ভারতে সবচেয়ে শক্তিশালী রাজ্য ছিল মেবার। মেবারের রানা সংগ্রাম সিংহ বা রানা সঙ্গ দুর্বল সুলতানি সাম্রাজ্যের স্থলে এক রাজপুত সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। গুজরাতে রাজত্ব করতেন দ্বিতীয় মুজাফ্‌ফর শাহ। তিনি রানা সঙ্গের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁর পুত্র বাহাদুর শাহের সঙ্গে বাবর-পুত্র হুমায়ুনের দ্বন্দ্ব চলে। বাবরের আক্রমণের সময় মালবের শাসক ছিলেন দ্বিতীয় মাহমুদ। রাজ্যের সব ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী মেদিনী রাই দখল করে নেন। রানা সঙ্গের সহায়তায় তিনি দ্বিতীয় মাহমুদকে পরাজিত ও বন্দি করলেও মেবাররাজ মাহমুদকে রাজ্য ফিরিয়ে দেন। উত্তর-পশ্চিমে সিন্ধুপ্রদেশে আরঘুন ও লংঘা বংশ কর্তৃত্বলাভের জন্য পরস্পর দ্বন্দ্বে লিপ্ত ছিল। ১৪৭০ খ্রি.-এ জইন-উল-আবেদিনের মৃত্যুর পর থেকে কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। দূরত্বের কারণে উত্তরভারতীয় রাজনীতিতে কাশ্মীরের বিশেষ প্রভাব ছিল

না। বাংলাদেশে হুসেন শাহের পুত্র নুসরত শাহ বাবরের সমসাময়িক ছিলেন। বিহারের নুহানী আফগানগণ বাবরের কাছে পরাস্ত হয়ে নুসরত শাহের কাছে আশ্রয় নেয়। বিহারের সুর বংশীয় আফগান নেতা শের খানসহ অন্যান্য আফগানদের সঙ্গে একযোগে নুসরত শাহ বাবরের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে ব্যর্থ হন। পরে তিনি বাবরের সঙ্গে সমঝোতা করে নিয়ে বাংলার স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখেন ওড়িশায় রাজত্ব করতেন গঙ্গ বংশীয় রাজাগণ। উত্তর ভারতের রাজনীতিতে ওড়িশার কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না।

মহম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকালের শেষভাগে দক্ষিণ ভারতে দুটি স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়—বিজয়নগর ও বাহমনী। বাবরের ভারত অভিযানের সময় তুলুভ বংশীয় কৃষ্ণদেব রায় ছিলেন বিজয়নগরের রাজা। প্রতিবেশী রাজ্যগুলিকে পরাস্ত করে তিনি বিজয়নগরকে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ রাজ্যে পরিণত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ও ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ায় বাহমনী রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়ে ও পাঁচটি পৃথক রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এগুলি হল আহ্‌মেদনগর, বিজাপুর, গোলকোন্ডা, বেরার ও বিদর।

অতএব বাবরের আক্রমণের প্রাক্কালে ভারতে কোনো শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন ছিল না। সুলতানি শাসন ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্লিষ্ট। পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন রাজত্বের সূচনা হয়। বাবরও তাঁর আত্মজীবনীতে ভারতে পাঁচজন স্বাধীন মুসলমান শাসক ও দুজন স্বাধীন হিন্দু শাসকের উল্লেখ করেছেন। এহেন এক দেশের পক্ষে বাবরের মতো এক কুশলী সেনাপতিকে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না।